সম্পাদকীয়

editorialamarbarta@gmail.com

ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হোক

মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা, যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক চুক্তি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অগ্রগতি। বহু সপ্তাহের সংঘাত, প্রাণহানি ও আঞ্চলিক
মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা, যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রাথমিক চুক্তি নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক অগ্রগতি। বহু সপ্তাহের সংঘাত, প্রাণহানি ও আঞ্চলিক উত্তেজনার পর দু'দেশের মধ্যে সংলাপের পথ খুলে যাওয়া শান্তিকামী মানুষের জন্য আশার বার্তা। তবে এ আশার পাশাপাশি বাস্তবতার একটি কঠিন দিকও রয়েছে। কারণ, সংঘাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ ইসরাইল এবং বিশেষত লেবানন পরিস্থিতি এখনও এই উদ্যোগের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। ধ্বংস হয় ঘরবাড়ি, বিপর্যস্ত হয় অর্থনীতি, অনিশ্চয়তায় পড়ে পুরো একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। ইরান, লেবানন এবং আশপাশের অঞ্চলের মানুষ গত কয়েক মাসে সে বাস্তবতার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। তাই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া শুধু একটি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সাফল্য নয়; বরং একইসাথে মানবিক জায়গা থেকেও এর কোনো বিকল্প নেই। এ চুক্তির গুরুত্ব মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা অতিক্রম করে বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ। এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পায়, সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ে। ফলে যুদ্ধবিরতি স্থায়ী হলে তার সুফল বিশ্বের বহু দেশ ভোগ করবে। তবে শান্তির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হতে পারে আস্থার সংকট। ইরানের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে বলা হয়েছে, লেবাননসহ সব সম্মুখসারিতে সংঘাত বন্ধ হওয়া চুক্তির চেতনার অংশ। অন্যদিকে লেবাননে ইসরাইলের সামরিক অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতির স্থায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কারণ, একদিকে আলোচনা চলবে আর অন্যদিকে সংঘাত অব্যাহত থাকবে, এমন বাস্তবতা দীর্ঘমেয়াদে কোনো সমঝোতাকেই টিকিয়ে রাখতে পারে না।

যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ। ধ্বংস হয় ঘরবাড়ি, বিপর্যস্ত হয় অর্থনীতি, অনিশ্চয়তায় পড়ে পুরো একটি প্রজন্মের ভবিষ্যৎ। ইরান, লেবানন এবং আশপাশের অঞ্চলের মানুষ গত কয়েক মাসে সে বাস্তবতার তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছে। তাই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া শুধু একটি রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সাফল্য নয়; বরং একইসাথে মানবিক জায়গা থেকেও এর কোনো বিকল্প নেই। এ চুক্তির গুরুত্ব মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা অতিক্রম করে বৈশ্বিক অর্থনীতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি পরিবহনপথ। এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পায়, সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যাহত হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর প্রতি আরও দায়িত্বশীল আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং অতীতেও মন্তব্য করেছেন যে, লেবাননে চলমান সামরিক পদক্ষেপ ইরানের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছানোকে কঠিন করে তুলছে। এ ধরনের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, ওয়াশিংটনও উপলব্ধি করছে যে সামরিক উত্তেজনা অব্যাহত থাকলে কূটনৈতিক উদ্যোগের সফলতা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। অন্যদিকে নেতানিয়াহু নিজের দেশের নিরাপত্তা স্বার্থের কথা উল্লেখ করে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন। এটি স্বাভাবিক যে প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকবে। কিন্তু নিরাপত্তার প্রশ্নে সামরিক শক্তির ব্যবহার যদি নতুন সংঘাত সৃষ্টি করে, তাহলে তা শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সবার জন্যই অস্থিতিশীলতা ডেকে আনে। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ইতিহাস বারবার সেই শিক্ষাই দিয়েছে।

চূড়ান্ত চুক্তির আলোচনায় ইরানের পরমাণু কর্মসূচি, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং জব্দ করা সম্পদের মতো জটিল বিষয়গুলো সামনে আসবে। এগুলো বহু বছরের অবিশ্বাস ও বিরোধের সঙ্গে জড়িত। তাই এসব ইস্যুর সমাধানে ধৈর্য, পারস্পরিক সম্মান এবং বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি অপরিহার্য। কেবল সামরিক চাপ বা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে টেকসই সমাধান অর্জন করা সম্ভব নয়। মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ যুদ্ধের ক্লান্তি থেকে মুক্তি চায়। তারা চায় নিরাপত্তা, উন্নয়ন এবং স্বাভাবিক জীবন। তাই ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের উচিত উত্তেজনা বৃদ্ধিকারী পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকা এবং সংলাপের পথকে অগ্রাধিকার দেওয়া। বিশেষত লেবাননসহ অন্যান্য সংঘাতপূর্ণ এলাকায় সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকলে এই উদ্যোগের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

শান্তির সুযোগ বারবার আসে না। বর্তমান উদ্যোগ সেই বিরল সুযোগগুলোর একটি। মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং লাখো মানুষের স্বার্থে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর হোক এবং সব পক্ষ এমন আচরণ করুক যা এ শান্তি প্রচেষ্টাকে দুর্বল না করে বরং শক্তিশালী করে। কূটনীতির এ পথই স্পর্শকাতর মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পথ।

জনআস্থা ফেরাতে অপরাধ দমনে কঠোর হোন

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মানুষ যখন ঘর থেকে বের হয়, তখন অন্তত এই বিশ্বাসটুকু রাখতে চায় যে দিনের শেষে নিরাপদে ঘরে ফিরতে পারবে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক হত্যাকাণ্ড, প্রকাশ্যে গুলি চালানো, ছিনতাই ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সেই স্বাভাবিক বিশ্বাসকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে।

সরকার বলছে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকেও আশ্বস্ত করা হচ্ছে যে, অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতা যেন অন্য এক গল্প বলে। টিআইবির সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের প্রথম একশ দিনে ৬০৬টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের মনে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতা যেন অন্য এক গল্প বলে। টিআইবির সাম্প্রতিক গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী সরকারের প্রথম একশ দিনে ৬০৬টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু মানুষের মনে যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

খুলনায় যৌথ অভিযান চলাকালেই প্রকাশ্যে বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম হত্যার ঘটনা ঘটেছে। রাজধানীতে কারামুক্তির কয়েক দিনের মধ্যেই কুখ্যাত সন্ত্রাসী কাইল্যা পলাশ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। দুটি ঘটনাই ভিন্ন প্রেক্ষাপটের হলেও একটি অভিন্ন সত্য সামনে নিয়ে আসে, তা হলো অপরাধী চক্রের দুঃসাহসিকতা এবং জনপরিসরে নিরাপত্তাহীনতার বিস্তার। রাজনৈতিক পরিচয় যাই হোক, হত্যাকাণ্ড কখনোই স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। কোনো দলের নেতাকর্মী যদি ধারাবাহিকভাবে হামলার শিকার হন, তবে তা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি রাখে। একইভাবে অপরাধজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ঘিরে সংঘর্ষও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার দুর্বলতাকে সামনে আনে। কারণ রাষ্ট্রের চোখে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনের মূল্য সমান এবং বিচার নিশ্চিত করাই আইনের শাসনের মূল শর্ত। উদ্বেগের আরেকটি বিষয় হলো, বহু ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তৎপর হলেও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগ দৃশ্যমান হয় না। গোয়েন্দা নজরদারি, স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ, চাঁদাবাজি ও অস্ত্রের নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত তদন্ত ছাড়া পরিস্থিতির স্থায়ী উন্নতি সম্ভব নয়।

কলেজ থেকেই হোক উদ্যোক্তা তৈরির শিক্ষা

মীর হাসিব মাহমুদ
সহকারী অধ্যাপক

ঢাকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিকেলের আড্ডা। কয়েকজন শিক্ষার্থী ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলছে। একজন বলছে কানাডার জন্য আইইএলটিএস কোচিং করছে, আরেকজন বলছে সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিতে নিতে তিন বছর পার হয়ে গেছে। পাশেই আরেকজন চুপচাপ বসে আছে। কারণ সে জানে, পরিবারের হাজার স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও এখনো বুঝে উঠতে পারেনি এই ডিগ্রি দিয়ে আসলে কী করবে।

এই দৃশ্য আজ শুধু একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়; পুরো বাংলাদেশের বাস্তবতা। দেশের হাজার হাজার তরুণ আজ শিক্ষিত, কিন্তু অনিশ্চিত। ডিগ্রি আছে, কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই। স্বপ্ন আছে, কিন্তু পথ নেই। সবচেয়ে ভয়ংকর বিষয় হলো, যে তরুণদের ওপর ভর করে বাংলাদেশ আগামী অর্থনীতি গড়বে বলে আশা করছে, তাদের একটি বড় অংশ আজ দেশ ছাড়ার সুযোগ খুঁজছে।

অন্যদিকে দেশের শিল্পখাত, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো আবার উল্টো অভিযোগ করছে যোগ্য লোক পাওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ একদিকে শিক্ষিত বেকারত্ব বাড়ছে, অন্যদিকে দক্ষ জনশক্তির সংকটও বাড়ছে। এই বৈপরীত্যই এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটগুলোর একটি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী, উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক বেশি। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করা তরুণদের একটি বড় অংশ দীর্ঘ সময় ধরে কর্মহীন থাকছে। গবেষণা সংস্থা সিপিডি এবং শ্রমবাজার বিশ্লেষকদের মতে, দেশে শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে বড় ধরনের অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে।

কেন এই পরিস্থিতি তৈরি হলো?

কারণ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো মূলত পরীক্ষাভিত্তিক। একজন শিক্ষার্থীকে ছোটবেলা থেকেই শেখানো হয় কীভাবে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতে হয়, কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই শেখানো হয় কীভাবে বাস্তব জীবনে সমস্যার সমাধান করতে হয়। ফলে চার বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করেও অনেক শিক্ষার্থী জানে না কীভাবে একটি পেশাদার সিভি তৈরি করতে হয়, কীভাবে ইন্টারভিউতে কথা বলতে হয় কিংবা কীভাবে একটি বাস্তব ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান করতে হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় এখনো অনেক ক্ষেত্রে পুরোনো কারিকুলাম পড়ানো হচ্ছে, অথচ বিশ্ব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, ডেটা বিশ্লেষণ, ডিজিটাল মার্কেটিং ও সাইবার নিরাপত্তা কিংবা উদ্যোক্তা বিষয়ক দক্ষতা এখন বিশ্ববাজারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখনো সেই বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

এই কারণেই দেশে চাকরি থাকলেও দক্ষ মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান প্রায়ই অভিযোগ করে যে তারা প্রয়োজনীয় দক্ষতার কর্মী খুঁজে পায় না। বিশেষ করে প্রযুক্তি, যোগাযোগ দক্ষতা, আধুনিক বিপণন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং ডিজিটাল অপারেশন এসব ক্ষেত্রে বড় ধরনের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। অথচ প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করছে।

সমস্যা আসলে শিক্ষার্থীদের মেধার নয়; সমস্যা হচ্ছে প্রস্তুতির। বাংলাদেশের অধিকাংশ তরুণকে এমন একটি কাঠামোর মধ্যে বড় করা হচ্ছে যেখানে চাকরি পাওয়াই চূড়ান্ত লক্ষ্য। ফলে তারা চাকরি খোঁজার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু কর্মসংস্থান তৈরি করার জন্য নয়। এই মানসিকতার কারণে শিক্ষিত বেকারত্ব আরও ভয়াবহ হচ্ছে।

বাংলাদেশের পরিবারগুলোয় এখনো একটি প্রচলিত ধারণা আছে, ভালো চাকরি মানেই সফলতা। ফলে একজন তরুণ যদি ব্যবসা শুরু করতে চায়, অনেক পরিবারই সেটিকে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখে। অথচ বাস্তবতা হলো, শুধু চাকরির ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের অর্থনীতি টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সরকার কিংবা বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান একা কখনোই লাখ লাখ তরুণের কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারবে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এই বাস্তবতা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে অনেক প্রচলিত চাকরির ধরন বদলে দিচ্ছে। যেসব কাজ নিয়মভিত্তিক এবং পুনরাবৃত্তি, সেগুলোর বড় অংশ ভবিষ্যতে অটোমেশন-এর আওতায় চলে যেতে পারে। ফলে আগামী পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে তরুণদের নতুন ধরনের দক্ষতা অর্জন করতেই হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বড় একটি অংশ এখনো সেই প্রস্তুতির বাইরে। এখনো অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে বুঝতে পারে না তার কোনো দক্ষতা আছে। অনেকেই জানে না ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে কোন কাজের চাহিদা বাড়বে। কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্যারিয়ার দিকনির্দেশনা অত্যন্ত দুর্বল। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ দক্ষতা, প্রযুক্তি কিংবা উদ্যোক্তা বিষয়ক বাস্তব ধারণা খুব কম দেওয়া হয়। ফলে অনেক তরুণ শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনের দৌড়ে অংশ নেয়, কিন্তু নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করতে পারে না।
বাংলাদেশ যদি সত্যিই এই সংকট থেকে বের হতে চায়, তাহলে শুধু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করলেই হবে না; নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এমন শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে। এমন শিক্ষা, যা একজন তরুণকে চাকরি খোঁজার পাশাপাশি নতুন কাজ তৈরি করার সাহসও দেবে।
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উদ্যোক্তা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের বাস্তব ব্যবসায়িক প্রজেক্টে যুক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টার্টআপ ইনকিউবেশন সেন্টার ও উদ্ভাবন গবেষণাগার এবং ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন বাড়ানো যেতে পারে।

মবোক্রেসির প্রভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ কীভাবে গড়ে উঠছে

এ কারণেই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন উদ্যোক্তা মানসিকতা তৈরি করা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কলেজ পর্যায় থেকেই শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা শিক্ষা, ডিজিটাল দক্ষতা এবং বাস্তবমুখী কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যদি ছোটবেলা থেকেই সমস্যা চিহ্নিত করা, দল পরিচালনা করা, আর্থিক পরিকল্পনা করা কিংবা ছোট উদ্যোগ পরিচালনার অভিজ্ঞতা পায়, তাহলে সে শুধু চাকরিপ্রার্থী হয়ে উঠবে না; বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীও হতে পারে।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এখন শিক্ষার্থীদের 'জব সিকার' নয়, 'প্রবলেম সলভার' হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কারণ ভবিষ্যতের অর্থনীতি শুধু চাকরিনির্ভর হবে না; বরং ইনোভেশন, স্টার্টআপ এবং প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোক্তা কার্যক্রমের ওপর দাঁড়াবে।

বাংলাদেশেও এই পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

কারণ বর্তমানে যে আরেকটি বড় সংকট তৈরি হচ্ছে, সেটি হলো মেধাপাচার। দেশের সবচেয়ে মেধাবী তরুণদের বড় একটি অংশ বিদেশে চলে যেতে চাচ্ছে। কেউ উচ্চশিক্ষার জন্য যাচ্ছে, কেউ চাকরির জন্য, আবার কেউ স্থায়ীভাবে বসবাসের পরিকল্পনা করছে।

কেন?

কারণ তারা দেশে নিজেদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে না। যখন একজন তরুণ দেখে দীর্ঘদিন পড়াশোনা করেও একটি স্থিতিশীল চাকরি পাওয়া কঠিন, যখন দেখে দক্ষতার চেয়ে অনেক সময় পরিচয় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়, যখন দেখে গবেষণা ও উদ্ভাবনের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই তখন সে এমন একটি দেশে যেতে চায় যেখানে তার কাজের মূল্যায়ন হবে।

বাংলাদেশের জন্য এটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ একটি দেশ তখনই এগিয়ে যায় যখন তার সেরা মেধাগুলো দেশেই থেকে কাজ করে। কিন্তু বাংলাদেশ এখন এমন এক পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে যেখানে তরুণদের বড় একটি অংশ দেশকে 'সম্ভাবনার জায়গা' হিসেবে নয়, বরং 'ছাড়ার জায়গা' হিসেবে দেখতে শুরু করেছে।

এই পরিস্থিতি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতির ওপর বড় প্রভাব ফেলবে। কারণ দক্ষ মানবসম্পদ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিদেশি বিনিয়োগ, প্রযুক্তি খাত, শিল্পখাত কিংবা আধুনিক সেবা খাত সব জায়গাতেই দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজন। কিন্তু যদি দেশের তরুণরা দক্ষতা অর্জনের আগেই হতাশ হয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতের অর্থনীতি বড় ধরনের সংকটে পড়বে।

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বিশ্লেষণেও বলা হয়েছে, ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হবে অভিযোজন সক্ষমতা, সৃজনশীলতা ও ডিজিটাল দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা। শুধুমাত্র ডিগ্রি দিয়ে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হবে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে এই বাস্তবতা আরও কঠিন হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধীরে ধীরে অনেক প্রচলিত চাকরির ধরন বদলে দিচ্ছে। যেসব কাজ নিয়মভিত্তিক এবং পুনরাবৃত্তি, সেগুলোর বড় অংশ ভবিষ্যতে অটোমেশন-এর আওতায় চলে যেতে পারে। ফলে আগামী পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে তরুণদের নতুন ধরনের দক্ষতা অর্জন করতেই হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বড় একটি অংশ এখনো সেই প্রস্তুতির বাইরে।

এখনো অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে বুঝতে পারে না তার কোনো দক্ষতা আছে। অনেকেই জানে না ভবিষ্যতের চাকরির বাজারে কোন কাজের চাহিদা বাড়বে। কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ক্যারিয়ার দিকনির্দেশনা অত্যন্ত দুর্বল। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ দক্ষতা, প্রযুক্তি কিংবা উদ্যোক্তা বিষয়ক বাস্তব ধারণা খুব কম দেওয়া হয়। ফলে অনেক তরুণ শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জনের দৌড়ে অংশ নেয়, কিন্তু নিজেদের সক্ষমতা তৈরি করতে পারে না।

বাংলাদেশ যদি সত্যিই এই সংকট থেকে বের হতে চায়, তাহলে শুধু নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করলেই হবে না; নতুন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। এমন শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুত করবে। এমন শিক্ষা, যা একজন তরুণকে চাকরি খোঁজার পাশাপাশি নতুন কাজ তৈরি করার সাহসও দেবে।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় উদ্যোক্তা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের বাস্তব ব্যবসায়িক প্রজেক্টে যুক্ত করা যেতে পারে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্টার্টআপ ইনকিউবেশন সেন্টার ও উদ্ভাবন গবেষণাগার এবং ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন বাড়ানো যেতে পারে। একই সঙ্গে জেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি ও দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা জরুরি।

সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে হবে। একজন উদ্যোক্তা, একজন উদ্ভাবক কিংবা একজন ফ্রিল্যান্সারও দেশের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ এই বাস্তবতা পরিবার ও সমাজকে বুঝতে হবে। কারণ ভবিষ্যতের বাংলাদেশ শুধু চাকরিপ্রার্থীদের দিয়ে গড়ে উঠবে না; গড়ে উঠবে দক্ষ, সৃজনশীল ও সাহসী তরুণদের হাত ধরে।

আজকের তরুণরা যদি সঠিক দিকনির্দেশনা, দক্ষতা এবং সুযোগ পায়, তাহলে তারাই বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি আমরা এখনই শিক্ষা, দক্ষতা ও উদ্যোক্তা উন্নয়নে গুরুত্ব না দেই, তাহলে শিক্ষিত বেকারত্ব আরও ভয়াবহ হবে, মেধাপাচার আরও বাড়বে এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি তার তরুণ জনগোষ্ঠী ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে পড়বে।

সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। কিন্তু সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মীর হাসিব মাহমুদ : সহকারী অধ্যাপক, সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়
mirhasib@lnabd.org

ব্যবস্থাপনাবিহীন অর্থনীতি এবং সুশাসনের চেহারা

রাবিনা সুলতানা

কয়েক মাস আগে ফেসবুকে একটি পডকাস্ট সামনে এল, যেখানে আমন্ত্রিত একজন আলোচককে বলতে শুনলাম, 'এ দেশের মানুষ পরিবর্তন চায় না, সবাই সমানভাবে দুর্নীতি করার সুযোগ চায়।' শুনে একটু থমকে গেলাম। মনে হলো কথাটা অস্বস্তিকর শোনালেও সত্য। তবে এটা 'সত্য' ততক্ষণই, যতক্ষণ তা দুর্নীতির প্রচলিত সংজ্ঞার আলোকে বিবেচিত হবে। কারণ, সবার দুর্নীতির উদ্দেশ্য এবং চিত্র একরকম নয়। সরকারি নিয়োগবাণিজ্য, ভূমি দখল, ব্যাংক খাত দুর্নীতির ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম।

কিন্তু এই মন্তব্য আমলা কিংবা রাজনৈতিক হর্তাকর্তাদের নিয়ে করা হয়নি, তিনি মন্তব্যটি করেছিলেন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের নিয়ে। খেটে খাওয়া মানুষ কি স্বেচ্ছায় দুর্নীতির পথ বেছে নেয় নাকি রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা তাদের বাধ্য করে, সেটিই এই লেখার মূল বিষয়।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০২২এর প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের অর্থনীতির প্রায় ৮৫ শতাংশই ধূসর, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় রহভড়ৎসধষ বপড়হড়সু এবং মোট জিডিপির প্রায় ৪৩ শতাংশ আসে এই খাত থেকে। অর্থাৎ এ দেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে যে খাতের ওপর, সেই খাত রাষ্ট্রীয় নিয়মনীতি, করব্যবস্থা কিংবা কোনো রকম নজরদারির আওতাভুক্ত নয়। রাস্তার হকার, রিকশাচালক, ক্ষুদ্র দোকানদার, গৃহকর্মী, কুটির শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি, শ্রমিক, বা দিনমজুররা এই খাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব পেশার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কিংবা দাপ্তরিক নথিপত্র নেই। ফলে এসব পেশায় জড়িত ব্যক্তিদের নেই কোনো পেশাগত নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা। ফলে এসব অধিকার ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেও জবাবদিহি করার সুযোগ নেই তাঁদের।

এসব পেশায় নানা রকম জটিলতাও আছে। এর সঙ্গে যুক্ত আছে রাজনৈতিক অর্থনীতি, ক্ষমতাকাঠামো, পেশিশক্তি, স্থানীয় রাজনৈতিক বাস্তবতা ইত্যাদি। অগত্যা এই সব পূর্বশর্ত মেনে নিয়েই নানান কায়দায় জীবিকা নির্বাহ করতে হয় নিম্ন আয়ের মানুষদের। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত ও সহজ পন্থা হচ্ছে চাঁদা বা জামানত দেওয়া। এই চাঁদা লেনদেনের অনানুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকলেও এগুলো কখনো সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয় না।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক লেনদেনের কোনো প্রমাণ রাষ্ট্রের কাছে থাকে না। যেহেতু রাষ্ট্র এই ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট নয়, এর সুবিধাভোগীদের জন্য এই লাভজনক খাতকে টিকিয়ে রাখা অনেকটাই সহজ এবং ঝুঁকিমুক্ত। এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গভীর থেকে আরও গভীরে পৌঁছে যায় এই বিষবৃক্ষের শিকড়।

রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনাকে পুঁজি করেই যখন জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তখন চাইলেও জবাবদিহি করার কোনো উপায় থাকে না। অনিয়মটাই নিয়ম হয়ে ওঠে, কারণ এর ব্যত্যয় ঘটলে ওলট-পালট হয়ে যাবে বিপুলসংখ্যক জনগণের জীবন। তাই চাইলেও পরিবর্তন দাবি করার সুযোগ নেই এ দেশের মানুষের।

তবে শুধু যে রাজনৈতিক অর্থনীতির দৌরাত্ম্যেই এই অব্যবস্থাপিত ব্যবস্থা টিকে আছে, তা নয়। পারস্পরিক নির্ভরতাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। একজন হকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনছেন একজন রিকশাচালক, আবার একজন হকার পান করছেন রাস্তায় কিংবা টংদোকানে বিক্রি হওয়া চা। এই নির্ভরতার ব্যাপ্তি ছাপিয়ে গেছে শ্রেণিবৈষম্যকেও। অফিসের সামনে থেকেই সিগারেট কিনছেন করপোরেট পেশাজীবীরা কিংবা পাড়ার ভ্যান থেকেই সবজি কিনে নিচ্ছেন অট্টালিকায় বসবাসকারী গৃহিণী। এই পারস্পরিক নির্ভরতা ধূসর অর্থনীতিকে একটি শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর চক্রে পরিণত করেছে, যাকে ভাঙা দুষ্কর বটে।

তবু প্রশ্ন থেকেই যায়। যারা এই চক্রের ভুক্তভোগী, এই সব পেশায় নিয়োজিত জনগণ, তারাও তো কখনো রাষ্ট্রের কাছে এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ কিংবা দাবিদাওয়া তুলে ধরে না। তাহলে কি তারাও এই শোষণমূলক ব্যবস্থায় শোষিত হতে চায়?

বিষয়টা যদি তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে বোঝা যায় যে তারা চাইলেও এই বলয় ভেঙে বেরোতে পারে না। কারণ, তাদের কাছে জীবিকা নির্বাহের আর কোনো সহজলভ্য বিকল্প আপাতত নেই। তাই এসব ফাঁকফোকরকে আশ্রয় করেই টিকে থাকতে হয় তাদের। রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনাকে পুঁজি করেই যখন জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তখন চাইলেও জবাবদিহি করার কোনো উপায় থাকে না। অনিয়মটাই নিয়ম হয়ে ওঠে, কারণ এর ব্যত্যয় ঘটলে ওলট-পালট হয়ে যাবে বিপুলসংখ্যক জনগণের জীবন। তাই চাইলেও পরিবর্তন দাবি করার সুযোগ নেই এ দেশের মানুষের।

তারই প্রমাণ মেলে সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকা শহরের হকার উচ্ছেদ অভিযানেও। উচ্ছেদের কয়েক দিনের মধ্যেই আবারও রাস্তাজুড়ে বসেছে সারি সারি দোকান এবং চলছে বেচাবিক্রি।

বর্তমান সরকার যদিও তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমাধান হিসেবে হকারদের ডিজিটাল পরিচয়পত্র দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু একে পুনর্বাসনের নামে ফুটপাত এবং রাস্তা দখলের প্রাতিষ্ঠানিক বৈধতা প্রদান করা হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের এই উদ্বেগ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু হকারদের এই প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের কিছু সুফলও আছে। এই উদ্যোগ যদি সফল হয় তাহলে এই বিশাল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের একটি তথ্যভান্ডার তৈরি হবে এবং সরকার সেখানে নজরদারি করতে পারবে।

পাশাপাশি এই ক্ষেত্র সিন্ডিকেটের কালো থাবা থেকে মুক্ত হয়ে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার পথ সুগম করবে, যা রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার লাঘব করার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেবে এবং সরকারি কোষাগারের আয়ের ক্ষেত্র তৈরি করবে। কিন্তু এই সমাধান স্বল্প মেয়াদে কার্যকর হলেও দীর্ঘ মেয়াদে রাষ্ট্রের ব্যয় বৃদ্ধি করবে এবং সম্পদ অপচয়ের ঝুঁকি তৈরি করবে। কারণ, এটি একটি সীমাহীন প্রক্রিয়া, একে কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি কিংবা সময়ের আওতায় আনা সম্ভব নয়। যত দিন পর্যন্ত রাষ্ট্র কোনো নিরাপদ এবং সুনিয়ন্ত্রিত বিকল্প তৈরি করবে না, জীবিকার তাগিদে মানুষ দখলদার, চাঁদাবাজদের শরণাপন্ন হবে।

এই বহুমাত্রিক সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান করতে হলে আগে জানতে হবে কেন এই কাঠামোবিহীন, অনিরাপদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্র বছরের পর বছর ধরে টিকে আছে। এর পেছনে অন্যতম একটি কারণ হলো কর্মসংস্থানের অভাব।

বিআইজিডি পরিচালিত দুর্দিনের ডায়েরি এবং ডেটা অ্যান্ড এভিডেন্স টু অ্যান্ড এক্সট্রিম পভার্টি নামক গবেষণায় উঠে এসেছে, গ্রামের ক্ষুদ্র চাষি, যাঁর নিজের আবাদি জমি নেই কিংবা নদীর ভাঙনে সব তলিয়ে গেছে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাড়িঘর হারিয়েছেন, এই সব জনগোষ্ঠী শহরমুখী হন কাজের সন্ধানে। অনেকেই আক্ষেপের স্বরে বলেছেন, তাঁরা ফিরে যেতে চান নিজের গ্রামে কিন্তু কাজের সুযোগ নেই বলে ফিরতে পারছেন না।

এখান থেকে ধারণা পাওয়া যায়, মানুষ স্বেচ্ছায় এই নিরাপত্তাহীন জীবন বেছে নেন না। স্থানীয় পর্যায়ে কাজের সুযোগ পেলে মানুষ এই জামানত আর চাঁদার চক্রে নিজেদের যুক্ত করবেন না।

তাই পুনর্বাসনের উদ্যোগ শুরু করতে হবে একদম গোড়া থেকে। একেবারে নিয়ন্ত্রণহীন থাকার চেয়ে সরকার বর্তমানে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যেতে হবে স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল করার।

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে, কারিগরি শিক্ষা জোরদার করা এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকরভাবে সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে গবেষণালব্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। তা না হলে লাখ লাখ কর্মক্ষম জনগণ যখন জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পাবে না, তখন তাঁরা নিকটতম বিকল্প হিসেবে এই ধূসর অর্থনীতিতেই যুক্ত হবেন। এবং রাষ্ট্রও বঞ্চিত হবে জনসম্পদের সুফল ভোগ করা থেকে।

বিআইজিডি পরিচালিত দুর্দিনের ডায়েরি এবং ডেটা অ্যান্ড এভিডেন্স টু অ্যান্ড এক্সট্রিম পভার্টি নামক গবেষণায় উঠে এসেছে, গ্রামের ক্ষুদ্র চাষি, যাঁর নিজের আবাদি জমি নেই কিংবা নদীর ভাঙনে সব তলিয়ে গেছে অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাড়িঘর হারিয়েছেন, এই সব জনগোষ্ঠী শহরমুখী হন কাজের সন্ধানে। অনেকেই আক্ষেপের স্বরে বলেছেন, তাঁরা ফিরে যেতে চান নিজের গ্রামে কিন্তু কাজের সুযোগ নেই বলে ফিরতে পারছেন না।
এখান থেকে ধারণা পাওয়া যায়, মানুষ স্বেচ্ছায় এই নিরাপত্তাহীন জীবন বেছে নেন না। স্থানীয় পর্যায়ে কাজের সুযোগ পেলে মানুষ এই জামানত আর চাঁদার চক্রে নিজেদের যুক্ত করবেন না।
তাই পুনর্বাসনের উদ্যোগ শুরু করতে হবে একদম গোড়া থেকে। একেবারে নিয়ন্ত্রণহীন থাকার চেয়ে সরকার বর্তমানে যে উদ্যোগ নিয়েছে, তা বাস্তবায়নের পাশাপাশি কাজ চালিয়ে যেতে হবে স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল করার। স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে, কারিগরি শিক্ষা জোরদার করা এবং তা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র বাড়াতে হবে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কার্যকরভাবে সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে গবেষণালব্ধ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে। তা না হলে লাখ লাখ কর্মক্ষম জনগণ যখন জীবিকা নির্বাহের পথ খুঁজে পাবে না, তখন তাঁরা নিকটতম বিকল্প হিসেবে এই ধূসর অর্থনীতিতেই যুক্ত হবেন। এবং রাষ্ট্রও বঞ্চিত হবে জনসম্পদের সুফল ভোগ করা থেকে।

রাবিনা সুলতানা রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (গবেষণা সহযোগী) হিসেবে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে (বিআইজিডি) কর্মরত। ইমেইল: rabeena.sultana@bracu.ac.bd